যুগান্তর

তারিখ ..১3 JUN. 2010...
পৃষ্ঠা ..২০.. কলাম ..৪..

বাবা-মায়ের নাম পরিবর্তন করে ভিকারুননিসায় ভর্তি

মুসতাক আহমদ/মুজিব মাসুদ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি দুর্নীতিতে দেশে নতুন পন্থার উদ্ভাবন ঘটেছে। পরীক্ষা না দিয়ে ভর্তি, কম নম্বর টেম্পারিং করে বাড়ানো, প্রশ্নপত্র ফাঁস, ডোনেশনে ভর্তি— এসব এখন পুরনো। নতুন পন্থাটি হচ্ছে 'বাবা-মায়ের নাম পরিবর্তন করে স্কুলেরই অধ্যয়নরত কোন ছাত্রীর বোন পরিচয়ে ভর্তি করা। ভর্তির পর এফিডেভিটের মাধ্যমে ফের আসল' বাবা-মায়ের নাম লেখা। এ চাঞ্চল্যকর জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে দেশের বিখ্যাত ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে। বিগত তিন বছর ধরে ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ কয়েকজন শিক্ষকের যোগসাজশে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট এ অপকর্ম করে আসছে। আর এর বিনিময়ে তারা

নানা অনিয়ম দেখে তদন্ত কমিটি তাজ্জব

রাতারাতি কোটিপতি বনে গেছেন। শুধু তাই নয়, বেপরোয়া এ ভর্তি বাণিজ্যের কারণে গভর্নিং বডির সদস্য ডা. মুজিবুর রহমান হাওলাদারকে হত্যার উদ্দেশ্যে লাখ টাকায় সন্ত্রাসী ভাড়া করে আক্রমণের অভিযোগ পর্যন্ত রয়েছে। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা সেটি। এ সিন্ডিকেট এতটাই শক্তিশালী যে, স্বয়ং প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্যরা পর্যন্ত অসহায়। ভর্তি বাণিজ্য জায়েজ করতে তারা গভর্নিং বডির সভাপতি থেকে শুরু করে অনেক সদস্যের অজান্তে তাদের নাম পর্যন্ত ব্যবহার করে আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অডিট ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) সাম্প্রতিক তদন্তে বেরিয়ে এসেছে ভয়াবহ ভর্তি ডাকাতির নানা তথ্য। রিপোর্টে দেখা যায়, নির্দিষ্টসংখ্যক আসনের বিপরীতে এভাবে দুর্নীতি আর অনিয়মের মাধ্যমে ছাত্রী ভর্তি করানোর কারণে ছিটকে পড়েছে মেধাবীরা। ফেল করা শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে ৩, ১০, ১৫, ১৮ নম্বর প্রাপ্তরা ভর্তির সুযোগ পেলেও বঞ্চিত হয়েছে ৬০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীরাও। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০০৮ সালের শিক্ষাবর্ষকে ভিত্তি করে ডিআইএ তাদের নিরীক্ষা পরিচালনা করে। কেবল ওই বছরই মূল ক্যাম্পাসসহ *অন্যান্য শাখায়

ভর্তি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ভর্তি : ভিকারুননিসায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সর্বমোট ৪০১ জনকে অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়। ২০০৯ সালেও হয়েছে একইভাবে দুর্নীতি। ২০১০ সালের ভর্তি এখন পর্যন্ত ২শ' ছাত্রীর অবৈধভাবে ভর্তির তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। তদন্ত কমিটি সূত্র ভর্তি জালিয়াতির লোমহর্ষক চিত্র তুলে ধরে জানায়, ২০০৮ সালের ৭৯ জন কম নম্বর পাওয়া ছাত্রীকে ভর্তি করা হয় ১ হাজার ৬৩৩ জন বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রীকে ডিঙ্গিয়ে। অথচ এসব ছাত্রীর বাবা-মায়েরা অনেকে রাতে স্কুলের সামনে অবস্থান করে লাইনে দাঁড়িয়ে ফরম তুলেছেন। তবে এর চেয়েও ভয়াবহ খবর হচ্ছে, পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও ভর্তি হয়েছে অনেকে। আবার তানিশা আলম নামে এক ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। পরে সে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে পিতা-মাতার নাম পরিবর্তন করে ফেলে। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি যুগান্তরকে জানান, ভর্তিতে এ দুর্নীতি-অনিয়মে প্রতিষ্ঠানটির বিদায়ী অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগমসহ সাবেক দুই অধ্যক্ষ জড়িত বলে তিনি তদন্ত রিপোর্টে দেখেছেন। তিনি বলেন, শুধু ভর্তি নয়, শিক্ষক নিয়োগ, বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ব্যয়, কেনাকাটা ইত্যাদিতেও ভয়াবহ অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে। ভর্তিকৃত ছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তিকালীন টাকা আদায় করা হলেও ২০০৭ ও ২০০৮ সালের অর্থের হদিস নেই। এ ব্যাপারে ডিআইএর তদন্ত কমিটি বিদায়ী অধ্যক্ষের কাছে হিসাব চেয়েও পায়নি। এর বাইরে দৈনন্দিন বেতন-ভাতা আদায়ের অনেক অর্থের হিসাবও পায়নি ওই কমিটি। সার্বিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য গভর্নিং বডিতে আলোচনা হবে বলে তিনি জানান। এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে ভিকারুননিসার যে সুনাম নষ্ট হয়েছে, সেটা ফিরিয়ে আনার জন্য যা যা করা দরকার সবই করা হবে।

তদন্ত রিপোর্টে যা আছে : তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০০৮ সালের প্রথম শ্রেণীর (বাংলা মাধ্যম) ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় ৩৬ থেকে সাড়ে ৪০ নম্বর পায় ২১০ জন ছাত্রী। আর ৪১ থেকে ৫০ নম্বর পর্যন্ত পায় ২১০ জন ছাত্রী। কিন্তু ভর্তির জন্য নির্বাচিত তালিকায় এদের কাউকে অন্তর্ভুক্ত না করে ৩৬ নম্বরের কম পাওয়া ৭২ জন ছাত্রীকে প্রথম তালিকায় নির্বাচিত করা হয়। ইংরেজি মাধ্যমে ৩৬ নম্বরের কম পাওয়া ৭ জন ছাত্রীকে প্রথম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একই বছর প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী মেধাক্রম অনুসারে অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। অথচ দ্বিতীয় তালিকার নামে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার ৬৮ জন ছাত্রীকে অন্য ছাত্রীর 'বোন' হিসেবে এবং ৭৫ জনকে কোন রেফারেন্স ছাড়াই ভর্তি করেন। দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করার পর আনুষ্ঠানিক আর কোন তালিকা প্রকাশ না করে ৯০ জন ছাত্রীকে অবৈধভাবে ভর্তি করানো হয়। এ ক্ষেত্রে মেধা তালিকায় থাকা ছাত্রীদের বঞ্চিত করে কম নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। এ ক্ষেত্রে ৫০-এর ওপরে নম্বর পেয়েও অনেক ছাত্রী ভর্তি হতে না পারলেও মাত্র ৪ নম্বর পেয়েও অনেকে ভর্তি হয়েছে। আর এ ভর্তির জন্য অধ্যক্ষ তদন্ত সংস্থাকে কোন রেফারেন্সও দেখাতে পারেননি। তদন্তকারী সংস্থা তালিকাবিহীন ভর্তির জন্য সম্পূর্ণভাবে অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তারকে দায়ী করে রিপোর্টে। আর প্রথম তালিকায় অনিয়মের জন্য তৎকালীন অধ্যক্ষ তাহমিনা বেগমকে অভিযুক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগম তদন্ত কমিটিকে বলেছেন, সরকারি-বেসরকারি, গভর্নিং বডির (জিবি) সদস্য, ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদির জোর তদবির, শিক্ষকদের মেয়ে, নিকটাত্মীয়, আজিমপুর শাখার সরকারি কোটা, সহোদর বোন ইত্যাদি কারণে ভর্তি কমিটি কম নম্বর পাওয়া ছাত্রীদের ভর্তি করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি।

দুর্নীতির রকমফের : তদন্ত রিপোর্টে দেখা গেছে, ২০০৮ সালে প্রথম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় এক শাখায় অংশগ্রহণ করে নির্বাচিত না হয়েও নীতিমালার বাইরে গিয়ে অন্য শাখায় ভর্তি হয়েছে— এরকম ছাত্রীর সংখ্যা ১০ জন। অনেকে পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও ভর্তি হয়েছে। তদন্তকালে দেখা গেছে, ফারিহা আফরোজ আলিকা, ভর্তি পরীক্ষার রোল নম্বর ১৮৭৮, ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরম তুলে পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। কিন্তু ২১ জানুয়ারি ২০০৮ সালে প্রকাশিত তালিকায় তার নাম ছিল। পরবর্তী সময়ে সে মূল প্রভাতী শাখায় ভর্তিও হয়। এ ধরনের মোট ছাত্রীর সংখ্যা ৩ জন। এছাড়া প্রথম তালিকায় নাম না থাকলেও প্রথম তালিকার ছাত্রীদের সঙ্গে ৩ জন ছাত্রী ভর্তি হওয়ার প্রমাণ পায় তদন্ত সংস্থা। তদন্ত কমিটি ভর্তি সংক্রান্ত রেকর্ড যাচাই করে দেখেছে, তানিশা আলম (পিতা আহসান, মাতা রোকসানা, রোল ১১২৬১) ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে নির্বাচিত হয় এবং ২৯ জানুয়ারি ২০০৮ সালে বসুন্ধরা প্রভাতী শাখায় ভর্তি হয়। কিন্তু ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে দেখা গেছে, ওই ছাত্রী নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে পিতা-মাতার নাম পরিবর্তন করেছে সুমাইয়া আলম। এ ধরনের অভিযোগ আছে ৩টি। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা গেছে, ২০০৮ সালে প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত মোট আসন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। শুধু ইংরেজি মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর জন্য মোট আসন সংখ্যার বিষয়ে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত থাকলেও বাংলা মাধ্যমে ভর্তির ক্ষেত্রে মোট আসন সংখ্যার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেই। নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল শিটে ভর্তি কমিটির সব সদস্যের স্বাক্ষর থাকার কথা থাকলেও তা নেই। নীতিমালা অনুযায়ী ২০ নম্বর পাস মার্ক ধরা হলেও সেটা অনুসরণ করা হয়নি। প্রকাশিত ফলাফলে মেধাবী ছাত্রীদের বঞ্চিত করে কম নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়েছে। কোন ছাত্রী অধ্যয়নরত অবস্থায় থাকলে তার বোন পরীক্ষায় অংশ নিলে তার জন্য ৫ নম্বর বোনাস দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে গভর্নিং বোডির কোন সিদ্ধান্ত তদন্তকালে অধ্যক্ষ দেখাতে পারেননি। অপরদিকে ২০০৮ সালে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১১২ জন ছাত্রী ভর্তি করানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে ৪ জন ছাত্রী ভর্তি করা হয় অধ্যক্ষ তাহমিনা বেগমের আমলে, বাকি ১০৮ জন ভর্তি করানো হয় অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগমের আমলে। এসব ভর্তির ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির কোন অনুমোদন ছিল না। সুপারিশের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ভর্তি কমিটির সদস্য শিক্ষিকা মাখরোজা আক্তার বলেন, ২০০৯ সালে টেবুলেশন শিটে নম্বর পরিবর্তন করে বাড়িয়ে দেয়া, খাতা পরিবর্তন করে বেশি নম্বর দেয়া, টেবুলেশন শিট পরিবর্তন করা, অধ্যয়নরত ছাত্রীর বোনদের ক্ষেত্রে ৫ নম্বর বাড়িয়ে দেয়া এবং বোন না থাকলেও বোনের বানানো নাম দেয়ার মতো অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে হরহামেশা। এ ধরনের অন্যায় কাজ আগে কখনও হয়নি। তিনি বলেন, এসবই অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগমের নির্দেশে তিনি এবং শাখাপ্রধানরা করেছেন। অধ্যক্ষ তাকে ওয়াদা পর্যন্ত করিয়েছিলেন, অবসর গ্রহণের পরও যেন কাউকে এসব কথা না জানান। শামীম জাহান আক্তার নামে অপর একজন শিক্ষক তদন্ত কমিটিকে বলেছেন, তিনি যা করেছেন সবই অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগমের নির্দেশে করেছেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ ২০ বছরের চাকরি জীবনে তিনি অনেক অধ্যক্ষের সঙ্গে ভর্তি কমিটিতে কাজ করেছেন। এর আগেও সুপারিশের ভিত্তিতে অনেক ভর্তি হয়েছে। কিন্তু সেসবের সীমা ছিল। এবার সেই সীমা লঙ্ঘন হয়েছে। আর শামীমা আক্তার নামে একজন শিক্ষক তদন্ত কমিটিকে বলেছেন, তার ধারণা ২০০৯ সালে ভর্তি পরীক্ষায় ২শর বেশি খাতার নম্বর পরিবর্তন, খাতা পরিবর্তন, টেবুলেশন শিট পরিবর্তন করা হয়েছিল। আর এসব দুর্নীতি ঢাকার জন্য সব টেবুলেশন শিট পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। তিনি লিখিতভাবে স্বীকার করেন, অধ্যক্ষার নির্দেশে তিনি শতাধিক খাতা পরিবর্তন এবং অন্যের নাম স্বাক্ষর করেছেন। এদিকে ২০১০ সালের ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগমের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। রিপোর্টে টেবুলেশন শিটে প্রাপ্ত নম্বর বৃদ্ধি করে ফলাফল পরিবর্তন করা ওইসব উত্তরপত্র গোপন করা এবং টেবুলেশন শিটের স্বাক্ষর জাল করার মতো গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট থেকে দেখা গেছে, অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে— সায়মা কবীর, ইসরাত আহমেদ, তারিন তাসবিনা ইসলাম, আইনান ইসলাম, সাভিয়া হোসেন, জান্নাতুল ফেরদৌস, মাহিন হুমায়রা।